



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 474 - 480

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

দেশভাগ ও ভূমিসংস্কার পরবর্তী উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন : প্রসঙ্গ বিপুল দাসের 'সরমার সন্ততি' উপন্যাস

সাগর সরকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: sagarsarkarbhu@gmail.com

 0009-0003-3269-7228

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Partition,
land reforms,
North Bengal,
landlords,
refugees,
land transfer,
socio-economic
change,
cultural
change.

Abstract

After the land reforms, the condition of the indigenous landowners of North Bengal became deplorable. The government distributed land to the poor royal family as well as to the landless people from East Bengal. As a result, many landless people found a little shelter to lay their heads on. Many sharecroppers or adhiyars thus regained their rights to their land. A mixed language culture developed through the coexistence of the two races. However, most of the people who benefited from land acquisition through the land reform program in North Bengal were displaced landless farmers from East Bengal. They are now gradually moving up the socio-economic ladder through land acquisition, agricultural skills, and education. On the other hand, the royal landowners and their successors lost their land, sold it, and moved from the cities of North Bengal to the villages. Fiction writer Bipul Das has focused on this change in North Bengal in his novel 'Saramar Santati'.

Discussion

উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের একটি ভৌগোলিক অঞ্চল। শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের প্রধান শহর; এই শহর একাধারে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মহানগর এবং সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। উত্তরবঙ্গের সমাজ গঠন চিত্র পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশ থেকে অল্প আলাদা। উত্তরবঙ্গে দেশীয় বা স্থানীয় মানুষের মধ্যে মঙ্গোলিয়ান প্রভাব বেশি মাত্রায় লক্ষ করা যায়। এখনো পর্যন্ত এখানকার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইন্দোমঙ্গোলিয়ান সংস্কৃতির প্রচুর প্রভাব রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি সংখ্যায় বসবাস করে। এছাড়া টোটো, রাভা, লেপচা, মেচ, শেরপা, ডুকপা প্রভৃতি জনজাতির লোকেরা উত্তরবঙ্গে বসবাস করে। রাজবংশী জনজাতির মানুষের সংখ্যা উত্তরবঙ্গে বেশি। এঁরা উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র হিসেবে পরিচিত। প্রকৃতির কোলে লালিত উত্তরবঙ্গের শান্ত ও সরল অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত সমাজজীবন স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরবর্তী সময় থেকে অস্থির হয়ে উঠে। দেশভাগ পরবর্তী উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনে অস্থিরতা বিভিন্ন কারণে হয়েছিল। তাদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল, উদ্ভাস্ত সমস্যা ও ভূমিসংস্কার। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর প্রচুর মানুষ উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতিতে চাপের সৃষ্টি

হয়। দেশভাগের আগেও অসংখ্য মানুষ উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশের স্বাধীনতা এবং দেশভাগের ফলে হাজার হাজার মানুষ দেশান্তরী হয়েছিল। বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচার জন্য শরণার্থীরা প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরবঙ্গেও লক্ষ লক্ষ সর্বহারা উদ্বাস্তুরা আসতে থাকে। উত্তরবঙ্গের গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গাতেই পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। উত্তরবঙ্গে এসে তারা বিভিন্ন নদীর পাড়ে ও জঙ্গলে বসতি স্থাপন করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি উত্তরবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে এই অঞ্চলের কৃষি জমির উপর ভীষণ চাপ পড়ে। কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল কৃষিজীবী। তারা এই দেশে আসার পর জোতদারের কাছ থেকে স্বল্পদামে জমি সংগ্রহ করে বসতি গড়ে তোলে। আবার ১৯৪৭ সালের দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৫৩ সালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন ও ১৯৫৫ সাল থেকে ভূমিসংস্কার আইন পাস করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে জমিদারি বা জোতদারি ব্যবস্থা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারি-জোতদারি বা অন্যান্য মধ্যস্থত্ব ভোগীদের দখলে যে সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি ছিল তা উদ্ধার করে ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে বন্টন করা। প্রথমে এই জমির উর্ধ্ব সীমা রাখা হয় ২৫ একর বা ৭৫ বিঘা জমি। পরে তা করা হয় সাত স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর জমি। ভূমিসংস্কারের কাজ শুরু হলে বহু সিলিং বহির্ভূত জমি জোতদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। সেই জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে বন্টন করা হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার আগে ভূমিসংস্কারের কাজ সেভাবে শুরু হয়নি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভূমিসংস্কারের কাজ এক নতুন মাত্রা পায়। জমি অধিগ্রহণ ও কৃষকদের মধ্যে বন্টনের পাশাপাশি চলে আধিয়ার বা বর্গাদারদের নথিভুক্তকরণের কাজ। এতকাল যে বর্গাদারদের জমিতে কোনো অধিকার ছিল না, তারা তাদের জমিতে অধিকার ফিরে পায়। তারপর সেই উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এই ভূমিবন্টন যেমন ভূমিহীন রাজবংশী মানুষদের মধ্যে হয়েছিল, তেমনি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ভূমিহীন মানুষদের মধ্যেও হয়েছিল। এরফলে বহু ভূমিহীন মানুষ তাদের মাথা গোঁজার মতো একটু আশ্রয় পেয়েছিল। বহু বর্গাদার বা আধিয়ার এইভাবে তাদের জমিতে স্বত্ব বা অধিকার ফিরে পেয়েছিল। তবে উত্তরবঙ্গে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে যারা জমি পেয়ে লাভবান হয়েছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু ভূমিহীন কৃষক। যাদেরকে স্থানীয় দেশীয় ভাষায় ‘ভাটিয়া’ বলা হয়। প্রাক্তন IAS অফিসার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রাক্তন জেলাশাসক সুখবিলাস বর্মা লিখেছেন, -

“With the partition of Bengal, there was influx of Huge number of refugees from East Bengal to the border districts of North Bengal. These people coming from East Bengal i.e. the Bhatias put tremendous pressure on the land-based rural economy. while major portion of landed property owned by the rajbanshi jotdars got vestedland the vested land went to the hands of landless people belonging to both Rajbanshis and non-Rajbanshis; the Bhatias, by dint of their hard labour, purchased the lands from the Rajbanshi jotdars, some of whom gradually got impoverished because of their habits.”^১

ভূমিসংস্কারের ফলে বহু রাজবংশী ও উদ্বাস্তু ভূমিহীন মানুষ মাথা গোজার মতো একটু জমি পেয়েছিলেন। আধিয়ার বা বর্গাদার যারা জমি চাষ করতেন শুধু ফসলের অর্ধেক ভাগের বিনিময়ে, যাদের জমিতে কোন অধিকার ছিল না, এই আইনের ফলে জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনগুলি কার্যকর করা ও ফলপ্রসূ করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের বুকো নানা অভিঘাত লক্ষ করা যায়। যার ফলে উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও সমাজজীবনে এক গভীর প্রভাব পড়েছে। এক সময়ের হাজার হাজার বিঘা জমির জোতদাররা আজ নিঃস্ব। এইসব জোতদারের উত্তরাধিকারীরা আজ কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন। এদের অনেকেই আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজের সঙ্গে যুক্ত। যারা পড়াশোনা শিখতে পেরেছে তারা কেউ চাকরি-বাকরির সঙ্গে যুক্ত আছে। কিন্তু বেশিরভাগই অসহায়। সুতরাং একদিকে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর প্রচুর মানুষের উত্তরবঙ্গে প্রবেশ ও অন্যদিকে ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কারের পর সমগ্র উত্তরবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতিতে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের মানুষদের মধ্যে এক ব্যাপক আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়।

আধুনিক কথাসাহিত্যিক বিপুল দাস বাংলা সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ কথাকার। কথাসাহিত্যিক বিপুল দাস তাঁর রচনায় উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র ও নিম্নবর্ণীয় মানুষের জীবন ও সংকটের মানবীয় আখ্যান সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লেখা শুরু করেন ষাটের দশক থেকে। স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নানান কারণে এক ব্যাপক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তন লক্ষ করা যায়। তারই প্রভাবে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র ও নিম্নবর্ণীয় মানুষের জনজীবনে পরিবর্তন ও সংকটকে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অভিজ্ঞতায় লক্ষ করেছেন। লেখক তাঁর এই বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে সজাগ দৃষ্টি ও সৃষ্টিশীল মনের হাত ধরে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ‘সরমার সন্ততি’ উপন্যাসে স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের দিকটি আমরা পর্যালোচনা করব।

লেখক বিপুল দাসের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস হল ‘সরমার সন্ততি’। গুরুচণ্ডালী প্রকাশনায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে। ‘সরমার সন্ততি’ উপন্যাসে লেখক ‘ভান্ডি সিং জোত’-এর জোতদার পরমানন্দ সিংহ বা ‘ভান্ডি সিং’ এর দাপট থেকে তাঁর পুত্র রূপলাল সিংহের বিপর্যয়ের একটি দীর্ঘ কালখন্ড দেখিয়েছেন। যে ভান্ডি সিং জোতদার একসময় ‘সমস্ত জোতদারের বাপ’ ছিল; ভূমিসংস্কারের পর তাঁর জমিদারি চলে যায়। উদ্বৃত্ত জমি আধিয়ার ও রিফিউজিদের মধ্যে বিতরণ হয়ে যায়। অবশেষে নকশাল আন্দোলনে তাঁর বাম হাতের পাঞ্জা কেটে যায়। জোতদার ভান্ডি সিং পরিণত হয় সাধারণ নাগরিকে। তার ছেলে রূপলাল সিংহ দারিদ্র ও বৃত্তির সমস্যায় বিভিন্ন সংকটের মুখোমুখি হয়। ভান্ডি সিং এর জোত নগরায়ণ ও বিশ্বায়নের প্রভাবে বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের ‘প্রফুল্লনগর’-এ পরিণত হয়ে পড়ে। সেই নগরে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের দেখা যায় না। সেই নগর থেকে তারা কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

লেখক ‘সরমার সন্ততি’ উপন্যাসে দেশভাগ বা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী উত্তরবঙ্গের সামন্তবাদের প্রতিনিধি জোতদার ভান্ডি সিংয়ের মাধ্যমে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। জোতদার ভান্ডি সিং এর ভালো নাম পরমানন্দ সিংহ। তার প্রখর ব্যবসা বুদ্ধি, ফল পাকুড়ের বিখ্যাত বাগান, আদিগন্ত বিস্তৃত জমি জিরেত, হার না মানার জেদ এবং যৌনবাসনার আধিক্য এই অঞ্চলে তাকে এক প্রবাদ পুরুষ বানিয়েছিল। পুরনো লোকজন দেখেছে বাদামী ঘোড়ার পিঠে ডাউকি নদী পার ধরে তাঁর ছুটে যাওয়া। অনেকে দেখেছে জোহনা রাতে ভান্ডি সিং উল্লার মত ছুটে গেল; তাঁর কোলের উপর সুন্দরী এক নারী। সেই ঘোড়া মরে গেলে ভান্ডি সিং একটা ডায়নামো বসানোর সবুজ হাঙ্গার সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। অসংখ্য গরু আর মোষের গাড়ি ছিল তার। এসব গাড়ি বোঝাই হয়ে ধান এবং পাট বিভিন্ন বন্দরে চলে যেত। ভান্ডি সিং-এই নাম উচ্চারিত হলেই ভয়, শ্রদ্ধা, বিস্ময় মেশানো একটা ছবি ফুটে উঠতো সবার চোখে। দিনের বেলা যতক্ষণ আকাশে সূর্য ততক্ষণ সে তার রাজত্ব টহল দিয়ে ফিরত। ডাউকি নদীর বাঁহাতি পার বরাবর যতদূর দৃষ্টি যায়, নামে বেনামে সবই ছিল তার তালুকের অন্তর্গত। শহরে ওষুধের দোকানের দেখাশোনা, কোর্ট কাছারি, বাধা উকিল নিরঞ্জন সান্যালের সঙ্গে শলা, পুরনো শিলভাঙির অখিল বর্মনের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া, চাষাবাদ এবং শস্যগোলায় দিকে নজর রাখা- এসব সামলাতে তার দিনগুলো ফুরিয়ে আসতো। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নারী জাতির উপর অত্যাচার ও সর্বনাশ করা ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়। ভান্ডি সিং-ও তাঁর জোতের অন্তর্গত গরীব প্রজার শতশত মেয়েদের নষ্ট করেছে। লেখক বর্ণনা করেছেন—

“কে জানে কীসে শান্তি পায় লোকটা। শতশত মেয়েছেলে তছনছ করল। দুচারদিন ভোগ করে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দ্যায়। কেউ শাড়ি গয়না পায়। কেউ ভাগ্যবতী- এক বিঘা জমি পায়। কেউ অভিষাপ দ্যায়। আর কারও আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। তবু তার তৃষ্ণার শেষ নাই। এই ভান্ডি সিং জোতে তার মন ভরে না। ব্রজ সিং জোত, রাজরাজেশ্বরী জোত, ঘুঘুডাঙ্গা, পেলকু ভিটা, কাউয়াখালি- সব মিলে বুঝি সে ভুঁইএগা হয়ে উঠতে চায়। সব চাকলা, সমস্ত পরগনার দখল চাই। হালমারার অধিকার চাই।”^২

জোতদার ভান্ডি সিং এভাবেই হয়ে উঠেছিল ‘সমস্ত জোতদারদের বাপ’। কিন্তু এই জগতে কিছুই স্থায়ী নয়। কালের নিয়মে সবই পাল্টে যায়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। একই সাথে দেশভাগের ক্ষত ও উদ্ভাস্ত সমস্যা ভারতবর্ষকে এক গভীর বোঝার চাপে ফেলে দেয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রনেতারা পুরোনো সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে এক সংসদীয় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্প নেয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জোতদারদের হাজার হাজার বিঘা জমি সরকার দ্বারা গ্রহণ করে গরিব ও ভূমিহীন জনগনের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে। তারই ফলস্বরূপ ১৯৫৩ সালে পুরো দেশে জমিদারী ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয় ও ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন পাস করা হয়। কিন্তু তবুও সেই আইনের ফাঁক ফোকরের মধ্য দিয়ে জমিদাররা অনেক জমি বেনামে দখল করে রেখেছিল। কংগ্রেস পার্টির সমর্থক জোতদার ভান্ডি সিং-ও বেনামে অনেক জমি দখলে রেখেছিল। তাঁর স্বগতোক্তিতে জানতে পাই—

“আমার নাম ভান্ডি সিং। জমির সিলিং হয়ে যাওয়ার পরও নামে বেনামে কত জমি ধরে রেখেছি আমি। কৃষিজমিকে অকৃষি করে দিয়েছি। কত নামে যে পঁচিশ পঁচিশ একর রেখেছি, আমার নিজেরই মনে থাকে না। ...সরকারি নিয়মে জোতদারি কবেই শেষ, আসলে তো তার পরেও কতকাল আমারই নিয়মে এই জোতে চন্দ্রসূর্য উঠেছে। পাটের দর উঠানামা করেছে। তারপর কখন যেন আপুলের ফাঁক দিয়ে গলে গেল সমস্ত শস্যদানা।”^৩

আইনের ফাঁক ফোকরের এর মাধ্যমে নামে বেনামী কিছু জমি ভান্ডি সিংহ দখলে রাখলেও, বেশিরভাগ জমি সরকার দখল নিয়ে যায়, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষেরা ধীরে ধীরে তার জমিতে বসতি গড়ে তোলে, বসে রিফিউজি কলোনি, বিএসএফ ক্যাম্প ইত্যাদি। সরকার থেকে প্রাপ্ত জমিগুলো পেয়ে রিফিউজিরা বসতি গড়ে তোলে। কৃষিকাজে পটু উদ্ভাস্ত লোকেরা বন্ধা জমিগুলোকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। লেখকের বর্ণনায় পাই—

“নতুন কলোনিতে রংপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লার সুদেব ঘোষ, বলরাম সাহা, শ্রীকৃষ্ণ দাস, স্বদেশপাল বাঁশের খুটি, দরমার বেড়া দিয়ে ঘর তোলে। কারও ছনের ছাউনি, কারও অ্যাসবেস্টাস বা চেউ তোলা টিনের চালা। ঘর তোলার পর যতটুকু মাটি পড়ে থাকে, প্রচণ্ড একটা খিদে নিয়ে এই মানুষগুলো যেন সেখানে হামলে পড়ে। চাষবাসের ভেলকি দ্যাখায় ওরা। বাজেডাঙা বলে যে জমিতে কেউ কোনও দিন হাল মারে নি, বীজ ছড়ায় নি, এক বছরেই সেই জমিতে যেন সোনা ঝলমল করে উঠল। পুরনো মানুষজন অবাক বিস্ময়ে ভাবে যে এই রিফিউজিদের হালবলদ, কোদালখুরপি নিশ্চয়ই মন্ত্রপুত।”^৪

জোতদার ভান্ডি সিংয়ের গলায় ফুটে উঠে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে জমি হস্তান্তরের বেদনার কথা—

“ওই একেখান জানালা দিয়ে মুই তামান সংসার দেখিবার পাছ। সব প্লাট গেল। ভাটির দেশ থেকে মানুষজন এসে সমস্ত জমিজমা জব্দ করে নিল। তামান জমিনত্ ভাটিয়া মানষিলা বাড়ী করিবার ধইছে। কত গাড়িঘোড়া, দোকানপাশার। বড় বড় দালান। মনটা কহে আলাদিন আসিয়া শহর খান বসে দিয়া গেল। অ্যালা ভান্ডি সিং-এর জোত বলি কিচছু নাই। সব শ্যাম হয়্যা গেল।”^৫

তাঁর আমবাগান, হেলাপুকুর, সমস্ত জমি ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সরকার, রেল দখল করে নেয়। তাই তাঁর মুখে ফুটে ওঠে হতাশার ছাপ—

“স্যালা মুই ভিখারী হয়্যা গেনু ...যাও হে কাঁচামিঠা, এইঠে বড় বড় উঁচা উঁচা বাড়ি হবার নাগে। ভান্ডি সিং জোত পরফুল্লনগর হয়্যা গেইসে। স্যালা আবার টাউন হবার ধইছে। ফের টাউন যে কুনদিন কলিকাতা হয়্যা যায়... হারামখোর। সগায় মোর পুটকি মারি দিয়া গেল। তামান শ্যাম হয়্যা গেল।”^৬

ভান্ডি সিং এর ছেলে রূপলাল সিংহ ছোটবেলা থেকেই নিজের পিতার এই জোতদারিকে ঘৃণা করেছে। তাকে শহরের বড় স্কুলে ভর্তি করাতে চাইলেও সে নতুন কলোনির রিফিউজি ছেলেদের সঙ্গে পাগলাহাটি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। কলোনির ভাটিয়া ছেলেদের সঙ্গে ডোবায় নেমে মাছ ধরত। রূপলালের নিজের ভেতরে একরকম আগুন ছিল। তা রক্তের

দোষ। তার পিতার রক্তের আঙুন বাইরের পৃথিবীতে ছাই করেছে। কিন্তু সে নিজেকে পোড়াতে চেয়েছিল। সে জোতদারিকে ঘৃণা করেছে। যোগ দিয়েছে শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতিতে, নকশাল আন্দোলনে। সে বন্ধুত্ব করেছে বিজনলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে। তারা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে। নকশাল আন্দোলনে যুক্ত থাকার দরুন সে অনেক বছর জেল খেটেছে। জেল থেকে বেরিয়ে রূপলাল সিংহ দেখেছে নিজের ‘ভান্ডি সিং জোত’-এর আমূল পরিবর্তন। এখন কিছই সে আর চিনতে পারছে না। বর্তমানে তার পিতার জোত পরিনত হয়েছে প্রফুল্লনগরে। সে প্রফুল্লনগরের আনাচে-কানাচে ভান্ডি সিং এর জোত খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সব গুপ্তগোল হয়ে যায় তাঁর। নতুন গড়ে ওঠা এই শহর আর সেই পুরোনো সেই শহর জুড়ে গিয়ে যে বিশাল এক মহানগর তৈরি হচ্ছে তা দেখে চোখ বিশ্বাস হয়না রূপলালের। উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক চিত্র ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন হচ্ছে লেখকের তা চোখের আড়াল হয়নি। সেই পরিবর্তনের ধারাকে ‘সরমার সন্ততি’ উপন্যাসে লেখক রূপলালের অবাক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। ঘসরু মিয়ার পুকুর যে কোথায় ছিল এই জায়গাটাই রূপলাল খুঁজে পায়না। সে এখন বিষহরি পালা গান শোনে না, মেছেনি খেলার নাচ দেখে না, মাগনের জন্য ধান-চাল পয়সা নিতে তাদের উঠানে কেউ আসে না। এই প্রফুল্লনগর— ছিল সাপের খোলস পরে থাকা আলপথ, হয়ে গেল হরিমন্দির রোড। ছিল পেলকুভিটা, হয়ে গেছে মাতঙ্গিনী কলোনি। ঘসরু মিয়ার পুকুরে টিউটরিয়াল রুম, ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে। তার জমি টুকরো টুকরো প্লটে ভাগ হয়ে নবপল্লী হয়ে গেছে। নতুন পথ দিয়ে রিক্সা, সাইকেল, ট্রাক, বাস সারাদিন ধরে চলাচল করছে। ফুলবাড়ি হাট তো চেনাই যায় না। ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস, ঝকঝকে রেস্টুরেন্ট, একটা সিনেমা হল, বাস টার্মিনাস। হাটচালা নেই, কালুর চায়ের দোকান নেই। আলোয় ঝলমল করে ফুলবাড়ি। মঙ্গলার হাট একটা সরু নর্দমা হয়ে গেছে, তেলিপাড়া হয়ে গেছে সুকান্ত পল্লী, নদীর ওপারে বসতি হয়ে গেছে কত কলোনি। তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে পৃথিবী মানচিত্র থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে তেলিপাড়া, পলাশ বন ও ডাউকি নদী। আর যত বালি পাথর নতুন শহর সব গিলে খায়। রূপলাল সিংহ নিজেদের স্বজাতি মানুষের চেনা মুখ ভুলে যেতে থাকে। অচেনা মানুষের মুখ তাদের জমি দখল করতে থাকে। অচেনা মানুষের ভিড়ে ভরে যায় গ্রামগঞ্জ টাউন বাজার। তাই তার মুখে ফুটে ওঠে স্বজাতি মানুষের হারানোর ব্যথা—

“কোথাও কোনও চেনা মুখ নেই। ওরা কোথায় গেল বাবা। চৈতু, ভাদু, আষাডু, বৈশাখু, নৃপেন, দিগেন, ধনেশ্বর, বাণেশ্বর, পেলকু, কাইচালুরা। সারাদিন অচেনা মুখের মিছিল। আমার সঙ্গে কেউ কথা বলে না। কাকু, তোমার গায়ের গন্ধ— বাচ্চাগুলো পালিয়ে যায়। আমাকে দেখলে আর যাঁড় দেখলে মেয়েবউগুলো পালিয়ে যায়।”^৭

উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র রাজবংশি জনজাতির মানুষেরা ধীরে ধীরে জমি বিক্রি করে দিয়ে গ্রামে চলে যায়। বৃত্তির সন্ধানে তারা ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। রূপলালের মুখে ফুটে ওঠে এই আক্ষেপের সুর—

“কিছু নেই। ...কোথায় গেল আমাদের সেই রাজবংশীজনের বসতি। পথে হেঁটে যাওয়া কোনও মানুষকে এখন চিনতে পারি না।”^৮

রাজরাজেশ্বরী জোত, কালীপ্রসন্ন জোত, গজল সিং জোত, নিপুর জোত, সবুর জোত, খালি সিং জোত বর্তমানে হয়েছে দেশবন্ধু পাড়া, কলেজ পাড়া, হাকিম পাড়া, হিলকার্ট রোড, বাবু পাড়া, মিলনপল্লী।

আর অন্যদিকে রূপলালের বাল্যবন্ধু বিজনলাল চক্রবর্তী এখন কলেজের বাংলার অধ্যাপক। তাঁর স্ত্রী পার্বতী একই কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। তারও বাড়ি ছিল ভান্ডি সিং জোতের তেলি পাড়ায়, যার বর্তমান নাম সুকান্ত পল্লী। তাঁর পিতা সহদেব মন্ডল পাবনা থেকে এসেছিল। ভান্ডি সিংয়ের জোতে তারা জমি পেয়ে ঘর বেঁধেছিল, পিতা সহদেব মন্ডল মুলিবাঁশের বেড়া বানাত। উপন্যাসে শেষে আমরা দেখতে পাই, বিজনলাল ও তাঁর স্ত্রী একত্রে এসেছে ভান্ডি সিং জোতদারের শেষ চিহ্ন বাড়ি-জমি কিনতে। যারা একসময় ভান্ডি সিং এর জোত জমিতে আশ্রয় পেয়ে রিফুউজি কলোনিতে ঘর বেঁধেছিল, তারাই আজকে পড়াশোনা, চাকরি করে ভান্ডি সিং-এর শেষ চিহ্ন জোতবাড়িটুকু কিনতে এসেছে। বাল্যবন্ধু বিজনলালকে

এখন আর চিনতে পায় না রূপলাল। নকশাল আন্দোলনে অভিযুক্ত রূপলাল একমাস কলেজের বাংলা অধ্যাপক বিজনলালের কোয়াটারে লুকিয়ে ছিল। রূপলাল তাকে একদিন জানায়, -

“বিজন, তোর সবকিছু কী সুন্দর পাল্টে গেছে। তোকে আর সেই রিফিউজি কলোনির বিজনলাল বলে চেনাই যায় না। তোর কথা বলা, চলাফেরা, জামাকাপড়...”^{১৬}

রূপলালের শেষ বারো কাঠা জমি আর ভাঙাচোরা বাড়ি কিনবে বলে বিজনলাল টাকা এডভান্স দিয়ে যায়। রূপলাল সিংহ তাঁর পূর্বপুরুষদের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুও ধরে রাখতে পারে না। বিজনলাল তাকে জানায়, -

“আসলে কতদিন আর তুই ঠেকিয়ে রাখবি। চারপাশ থেকে তোর এই জমি বাড়ির দিকে সবাই এগিয়ে আসছে। কায়দা করে তোর আলো বাতাসের সাপ্লাই বন্ধ করে দিচ্ছে। শহরের মাঝখানে এই বাড়ির একটা বেখাপ্পা ব্যাপার হয়ে রয়েছে। শহর গড়ে তোলার পেছনে একটা সৌন্দর্যের ব্যাপারও তো আছে। ঝাঁ চকচকে প্রফুল্লনগরের মাঝখানে একফোঁটা ভান্ডি সিং জোত এখনও রয়ে যাবে...পুরো দুখটাই ছানা কেটে যাচ্ছে।”^{১৭}

রূপলাল অর্থ কষ্টে বাধ্য হয়ে তাঁর জমি বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে। ধানি জমি ছিল এক টুকরো। সোমারু দেখাশোনা করত। ঘরের দামি জিনিসপত্র এক এক করে গিরিবালা মাসি বিক্রি করে দিয়েছে। পুরনো বাসনপত্রের ভেতর মাঝখানে রূপলাল লেখা একটা ভারি কাসার থালা শুধু হয়ে গেছে। সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিয়ে রূপলাল অনেক দূরে এক অজানা ভবিষ্যৎ যাত্রায় পাড়ি যেতে চায়। তাদের জোত জমির উপরে একটা শহর গড়ে উঠেছে। কত মানুষ কত রকম ভাবে করে খাচ্ছে- চা-দোকান, মুদির দোকান, স্টেশনারি দোকান, জমির দালালি, বালি পাথরের সাপ্লায়ার, ঠিকাদারি, প্রোমোটোরি- রূপলাল সিংহ কিছুই করতে পারল না। অথচ একসময় রূপলাল সিংহ ছিল এ সমস্ত জমির মালিক। সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতিভূ ভান্ডি সিংহের ছেলে রূপলাল সিংহ এখন সহায়সম্বলহীন। ভূমিপুত্র ও রিফিউজিদের সৃষ্টি হয় এক ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। ইতিহাসের কি আশ্চর্য খেলা। অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী তথা লোকসভার সদস্য উপেন্দ্রনাথ বর্মণ সেই দূরবস্থার কথা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, -

“খাস জমির সীমা বেঁধে দেওয়া হল, কিন্তু এই জমির ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির কোন কার্যকর ব্যবস্থা অন্ততঃ উত্তরবঙ্গে আজও করা হইল না। ফলে এককালের ভূমি নির্ভর শ্রেণির বেশিরভাগ অদৃষ্টের পরিহাসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছে।”^{১৮}

দেশভাগ পরবর্তী উত্তরবঙ্গে শুধু আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনই নয়, ধীরে ধীরে এক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র রাজবংশী মানুষের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষের মেলামেশার ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সৃষ্টি হয় এক মিশ্র ভাষার। উপন্যাসে লেখক বর্ণনা করেছেন -

“ক্লাস ফোরের দীপক অধিকারী বলেছিল- হামাগোলার কালির বড়ি আছে, তোর আছে? উত্তেজনাতে সে হামারলার এবং আমাগো মিশিয়ে হামাগোলার বলেছিল। সে জানতো না দু'রকম জল স্রোতের যে ধারা সামনের দিনগুলিতে এই জনপদের জমিকে আরো শস্যশ্যামল করে তুলবে, এইসব জোত একদিন কলোনি হবে, পাড়া হবে, একটা মফসসল শহর হয়ে উঠবে। তারপর আরও বড় শহর, যেন বা দ্বিতীয় কলকাতা-ই হতে চাইবে- আদি শ্লোকের মত তার মুখ দিয়েই দুটো ধারা মিশতে শুরু করল। এ অঞ্চলের মানুষ একদিন যে মিশ্র ভাষায় কথা বলবে- প্রচলিত মান্য বাংলা ভাষা, ছিন্নমূল মানুষদের আঞ্চলিক কথ্য ভাষা আর প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনের এক জনজাতির মুখের ভাষা মিলেমিশে একটা চলতি ভাষা তৈরি হবে—দীপক অধিকারী জানতেই পারে নি। দৈবাৎ সে ‘হামাগোলার’ বলে ফেলেছিল।”^{১৯}

রূপলাল ছোটবেলা থেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কৃষিজীবী ছেলেদের সঙ্গে মিশেছে, খেলাধুলো করেছে, একসঙ্গে মাছ ধরেছে, সরস্বতী ঠাকুরের পূজার বিসর্জন দিয়েছে। বন্ধু বিজনলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে সে খেলাধুলা ও পড়াশোনা করেছে। মিশ্রণ হয় ভাষার—

“আজকাল রূপলালের কথার ভেতরে বিজনলালদের কথা ঢুকে যায়। আবার বিজনলালও হঠাৎ কখনও রাজবংশী প্রবাদ বলে। ওদের অজ্ঞাতসারেই ভাষার এই চলন, গ্রহণ, প্রতিগ্রহণের খেলা চলে।”^{১০}

একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে উত্তরবঙ্গে একটি মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি থাকার ফলে এখন আর ভাষা বোঝার আরম্ভতা অতটা নেই।

সুতরাং একদিকে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর প্রচুর মানুষের উত্তরবঙ্গে প্রবেশ ও অন্যদিকে ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কারের পর সমগ্র উত্তরবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতিতে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের মানুষদের মধ্যে এক ব্যাপক আর্থ সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে দেখা যায় এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, গড়ে ওঠে এক মিশ্র সংস্কৃতি। লেখক বিপুল দাসের ‘সরমার সন্ততি’ উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের দেশভাগ ও ভূমিসংস্কার পরবর্তী উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

Reference:

১. Barma, Shukhbilas। “Social and Political tension in North Bengal since, 1947, Sainen Debnath (ed), N.L. Publishers, Siliguri, 2016, page. 92
২. দাস, বিপুল, সরমার সন্ততি, গুরুচণ্ডা প্রকাশনা, ডিসেম্বর ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ২৮
৩. তদেব, পৃ. ১০৮
৪. তদেব, পৃ. ৩৫
৫. তদেব, পৃ. ৬৩
৬. তদেব, পৃ. ১০৭
৭. তদেব, পৃ. ৬৪
৮. তদেব, পৃ. ৫৬
৯. তদেব, পৃ. ৫৪
১০. তদেব, পৃ. ১৬৩
১১. বর্মণ, শ্রী উপেন্দ্রনাথ, “উত্তর-বাংলার সেকাল ও আমার জীবন-স্মৃতি”, সম্পাদনা ও সংযোজনা আনন্দগোপাল ঘোষ, সংবেদন, মালদা, ২০১৫, পৃ. ৬২
১২. দাস, বিপুল, সরমার সন্ততি, গুরুচণ্ডা প্রকাশনা, ডিসেম্বর ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৬
১৩. তদেব, পৃ. ৩৫